কিছু কথা না বলেও বলা হয়ে যায়

কিছু কথা

না বলেও বলা হয়ে যায়

ড. মির্জা গোলাম সারোয়ার পিপিএম

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Kichu Katha Na Boleo Bola Hoye Jai by **Dr. Mirza Golam Sarwar PPM**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95365 0 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

ডা. ইফাত আরেফিন নূপুরকে

হামিদ মিয়া পুলিশের একজন ট্র্যাফিক কনস্টেবল। স্ত্রী রোকেয়া এবং একমাত্র মেয়ে কণাকে নিয়েই তার সাজানো সুখের সংসার। তার ইচ্ছা যে পুলিশের নিম্নপদে চাকরি করলেও মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে অনেক বড়ো করবে। তাইতো কণাকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন আর আশা। হৃদয়জুড়ে আকাশছোঁয়ার রাশি রাশি স্বপ্ন। স্বপ্ন পূরণের অদম্য বাসনা নিয়ে মনের মধ্যে প্রশান্তি এসে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে যায়। মনপ্রাণ হয়ে ওঠে সদ্যফোটা ফুলের মতো তরতাজা এবং প্রাণবন্ত। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সব সময় বিভোর থেকে তার হৃদয়জুড়ে স্নেহভালোবাসার পূর্ণতায় এক অপার মমত্ব ফুটে ওঠে। তার সাদা মনের অঙিনাজুড়ে শুধু মেয়ের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রঙিন স্বপ্ন। যে স্বপ্নের নেই কোনো শেষ।

কণা ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। ডাগর ডাগর চোখ, লম্বা হাত-পা, হাসলে গালে টোল পড়ে, পুরো চেহারায় কেমন যেন অদ্ভুত মায়া এসে ভর করে। সে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। খুব ধীরস্থির এবং শান্ত স্বভাবের। কথা বলে খুব মিষ্টিভাবে। সারাক্ষণ মুখে স্নিগ্ধ হাসি লেগেই থাকে। ভালো আচরণের জন্য স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাকে পছন্দ করে। সেও সবাইকে সম্মান জানিয়ে কথা বলে। কথা বলার ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। তার হৃদয়জুড়ে নতুন এক প্রাণের স্পন্দন। লাজুক সূর্যের আলোর মতো দু-চোখে বয়ে যায় স্বপ্নের ঝিকিমিকি আলো। যেখানে শুধু বাবার স্বপ্ন পূরণের অনেক আশা।

কণা অত্যন্ত মেধাবী। এ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় সে সর্বাচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এত ভালো ছাত্রী স্কুল-সহ অত্র

এলাকায় এর আগে আর দেখা যায়নি। বাবা-মায়ের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক এবং গ্রামবাসীরা তাকে নিয়ে গর্ব করে থাকেন। ভালো ছাত্রী হিসেবে সে সুখ্যাতি অর্জনের পাশাপাশি এলাকার সুনামও বয়ে এনেছে। মেয়ের এই অসাধারণ কৃতিত্বে হামিদ মিয়া ও তার স্ত্রী রোকেয়া খুবই গর্বিত। মেয়ের কারণে এলাকায় তাদের সামাজিক মর্যাদা ও মানসম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কণা প্রতিবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার পর ফল হাতে বাসায় এসে বাবা-মাকে জানালে তাদের মনে বয়ে যায় খুশির বন্যা। আনন্দে আপ্লুত হয়ে হামিদ মিয়া এবং রোকেয়ার দু-চোখ পানিতে ভরে যায়। ওইদিন বাজার থেকে অনেক মিষ্টি এনে পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িতে বিলি করে সবার দোয়া চায়। ভালো ফলাফলে পাড়াপ্রতিবেশীরাও খুব খুশি হন এবং কণা ও তার বাবা-মায়ের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করেন। লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ আর পরিশ্রম কণাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে। এ বয়সেও সে অনেক ছেলেমেয়ের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় এবং আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

প্রতিবারের মতো এবারও কণা চতুর্থ শ্রেণিতে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার এই অভাবনীয় সাফল্য ও ফলাফল স্কুলে সাড়া ফেলে দেয়। শিক্ষক-সহ সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভালো ফল করতে পেরে সেও খুশি। কারণ প্রতিবারের মতো এবারেও সে তার বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে। আর এটাই তার পরম তৃপ্তি। ফলাফল হাতে বাড়ি পৌঁছাতেই বাবা-মা তা দেখে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। সেও চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। খুশিতে হামিদ মিয়া ওইদিন আর ডিউটিতেই যায় না। সারাদিন বাড়িতে বসে মেয়ের সাথে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেয়। যেন তাদের বাড়িতে ঈদ। কারণ ঈদের দিনেও তাদের মনে এতটা খুশি বয়ে যায় না। যতটা খুশি কণার ফলাফলের দিনে পায়। কণাকে নিয়ে হামিদ মিয়া ও রোকেয়া স্বপ্নের জাল বুনতেই থাকেন। এই স্বপ্নের যেন কোনো শেষ নেই। তাদের ইচ্ছা কণা বড়ো হয়ে ডাক্তার হবে। কারণ ছোটোকালে হামিদ মিয়া তার বাবাকে চিকিৎসার অভাবে চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করতে

দেখেছে। অজ পাড়াগাঁয়ে কোনো ডাক্তার না-থাকায় তার বাবার ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারেনি। কবিরাজি ঔষধের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। বাবার পরিস্থিতি খারাপ হলে পাশের গ্রামে একজন এলএমএফ ডাক্তারকে আনার জন্য গেলে তিনি আসতে পারবেন না বলে সরাসরি মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই হামিদ মিয়া প্রতিজ্ঞা করেছিল, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সে তার সন্তানকে যেভাবেই হোক লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তার বানাবে এবং তাদের নিজের-সহ আত্মীয়স্বজন এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের ফ্রি চিকিৎসা করাবে। চিকিৎসার অভাবে তার বাবার মতো আর যেন কাউকে মারা যেতে না হয়। বাবার মৃত্যু এখনো তাকে কাঁদায়। একগুচ্ছ ব্যর্থতার গ্লানি আর দুঃখে তার দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বেদনায় আপ্লুত হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টিধোয়া পাতার মতো নীরব হয়ে বয়ে থাকে। বিষণ্নতা ও হতাশা কাটিয়ে অনেক আশায় বুক বাঁধে, মেয়েকে ডাক্তার বানাবে। তার চোখেমুখে বয়ে যায় অনেক রঙিন আশা। অনন্ত সুখের এক টুকরো স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্নিল মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দু-চোখে ভরে ওঠে প্রশান্তির ছায়া। পৃথিবীটা তখন তার কাছে খুব সুন্দর মনে হয়। সবুজ পাতার মতো অঙ্কুরিত হতে থাকে তার চিন্তাভাবনাগুলো। প্রাণভরা উচ্ছ্বাসে ভাসতে থাকে সে আর রোকেয়া। হৃদয়ে বয়ে যায় অনেক আনন্দের হিন্দোল। ঘনমেঘের চাদর সরিয়ে স্বপ্নঘুড়িটা আকাশে উড়িয়ে মেয়ের পানে চেয়ে তাকিয়ে থাকেন আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন নিয়ে। মনের কালোমেঘ নিমেষেই উধাও হয়ে যায়। তাদের মুখে ফুটে ওঠে সহজসরল প্রাণবন্ত হাসি। স্বপ্নিল দু-চোখে দেখা দেয় অনেক আশার আলো। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলেন। মেয়ের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক অদৃশ্য সুতায় চিরকাল বাঁধা। তাইতো সুযোগ পেলেই মেয়েকে কাছে টেনে পরম স্নেহে হামিদ মিয়া মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে। বাবা-মেয়ের এই ভালোবাসা দেখে রোকেয়া মনে মনে খুব স্বস্তিবোধ করে।

কয়েকদিন পর স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির নতুন বই দেবে। কণা বাবাকে আগে থেকেই বলে রেখেছে ওইদিন তাকে নিয়ে নতুন বই আনতে যাবে। মেয়ের উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে হামিদ মিয়া আর না বলতে

পারেনি। বাবার কথা শুনে কণার মনে বয়ে যায় অনেক আনন্দের সমাহার। অধীর আগ্রহ নিয়ে দিন গুনতে থাকে। কিন্তু সময় যেন কাটতেই চায় না। মনে মনে ভাবে, ইস কতদিন বাবার সাথে স্কুলে যাওয়া হয়নি। সেই যে ভর্তির সময় বাবা গিয়েছিল, সময়াভাবে আর যেতে পারেনি। কণা আরো ভাবে, ওইদিন নতুন বই নিয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে বাবাকে নিয়ে সে শহরে সারাদিন ইচ্ছেমতো ঘুরবে। দোকানে গিয়ে আইসক্রিম ও ফুচকা খাবে। নিজের জন্য কাচের লাল চুড়ি কিনবে। মায়ের জন্যও নিতে ভুলবে না। সময় পেলে চিড়িয়াখানা ও পার্কে ঘুরবে। তার বান্ধবীরা নিজ নিজ বাবাদের সাথে কতবার যে চিড়িয়াখানা ও পার্কে বেড়াতে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। অথচ এ পর্যন্ত তার যাওয়া হয়নি। কিন্তু এবার সে যেভাবেই হোক তার মনের আশা পূরণ করবে। এ সময় তার মনটা খারাপ হয়ে যায় এই ভেবে যে, ইস ঘোরার সময় যদি তার মা সঙ্গে থাকত তবে কতই-না মজা হতো? তার বান্ধবীরা যখন মা-বাবা-সহ একত্রে ঘোরার কথা বলে তখন তা শুনে কণার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। ভাবে, আহারে সে যদি তার বাবা-মায়ের সাথে মাঝে মাঝে একসাথে ঘুরতে পারত। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। কারণ বাবা যে চাকরি করে তাতে তার সময় হয় না। সে কারণে তার ঘোরাও হয় না।

কণা সব সময় ভাবে, বুঝতে শেখার পর থেকে সে দেখে আসছে, সকালে বাবা যখন ডিউটিতে যায় তখন সে ঘুমিয়ে থাকে। আবার রাতে যখন বাবা বাসায় ফেরে তখনো সে ঘুমিয়ে থাকে। ফলে বাবার স্নেহ ও আদর সে ঠিকমতো পায় না। আবার বাবাকেও তার আদর করা হয় না। বাবাকে তার খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ডিউটির কারণে বাবাকে তার কাছে পাওয়াই হয় না। অবশ্য মা বলেছে বাবা ডিউটিতে যাওয়ার সময় এবং ডিউটি থেকে ফিরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে কপালে চুমু খেয়ে আদর করে যায়। এ কথা শুনে বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় কণার মাথা নত হয়ে আসে। বাবার প্রতি মমতায় তার দু-চোখ মনের অজান্তে পানিতে ভরে ওঠে।

কণার মনে পড়ে, একবার শরীর খারাপ থাকায় বাবা দুদিন ছুটি নিয়ে বাসায় ছিল। ওই দুদিন এক মুহূর্তের জন্য সে বাবাকে কাছছাড়া করেনি। সারাক্ষণ বাবার পাশে বসে বাবার খেদমত করেছে। কিছুটা সুস্থবোধ করলে অনেক কথা বলেছে। বাবার ছোটোবেলার গল্প, দুষ্টুমি, হাসিকান্না পাওয়া-না-পাওয়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং সুখ-দুঃখের অনেক কথা শুনেছে। এ সময় কখনো তার মুখ হাসিতে আবার কষ্টে দু-চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। বাবা কথা বলার সময় কণা একদৃষ্টে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাবার দিকে তাকিয়ে থাকত। বাবার জন্য তার খুব মায়া লাগে। ইস বাবার স্বাস্থ্য অনেক খারাপ হয়ে গেছে। চেহারাটা কেমন যেন মলিন। আগের মতো আর সেই জৌলুস নেই। দু-চোখের নিচে কালো দাগ পড়েছে। আগে বাবাকে দেখতে হিরোর মতো লাগত। বাবার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে তার কান্না পায়। এ সময় তার চোখ থেকে কয়েকফোঁটা পানি কপালে গড়িয়ে পড়লে বাবার ঘুম ভেঙে যায়। কিরে মা কাঁদছিস? মুখ ঘুরিয়ে চোখ মুছে বলে, না বাবা। চোখে কী যেন পড়েছে। হামিদ মিয়া অবশ্য বুঝতে পারে মেয়ে তার জন্য কাঁদছে। আবেগে সেও চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। মুখ ঘুরিয়ে মেয়ের অগোচরে তার চোখ থেকে কয়েকফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মেয়ের প্রতি মমতায় তার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বেলা পড়তেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোর আভায় হামিদ মিয়ার লালিত স্বপ্ন আরও ঝলকে ওঠে।

দুদিনের মধ্যেই হামিদ মিয়া সুস্থ হয়ে যথারীতি খুব সকালে ডিউটিতে যোগদান করে। বাবা যাওয়ার পর কণাও স্কুলে গিয়ে জানতে পারে আগামীকাল খুব সকালে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুল

কর্তৃপক্ষ পঞ্চম শ্রেণির নতুন বই দেবেন। প্রত্যেকেই বাবার সাথে এসে নতুন বই গ্রহণ করবে। বাবাকে নিয়ে নতুন বই বিতরণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার কথা শোনার পর থেকে কণার মনে বয়ে যায় অনেক খুশির বন্যা। ডিউটির কারণে বাবা এ পর্যন্ত স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেনি। থাকবে বলেও সুযোগ পায়নি। এবার আর কোনো অজুহাত নয়। কণা যেভাবেই হোক সে বাবাকে নিয়ে যাবে। বাবার উপস্থিতিতে নতুন বই গ্রহণ করে প্রথমেই বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পায়ে সালাম করবে। তখন বাবা কত-যে খুশি হবে তা চিন্তা করতেই কণার মন আনন্দে নেচে ওঠে। স্কুলে আর দেরি না করে দ্রুত বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। আজ যেন রাস্তা ফুরাতেই চায় না। বসন্ত হাওয়ার মতো উদ্দাম হয়ে সে বাড়ির পথে এগিয়ে চলে। নতুন এক প্রাণের স্পন্দনে চোখে তার রাশি রাশি স্বপ্ন আর নিত্যনতুন আশা এ সময়ে দূরে গাছের ডালে বসে একটি কোকিল কুহুকুহু বলে ডেকে যাচ্ছিল। মনে হয় কণার সাথে সাথে সেও আনন্দিত।

বাড়ির গেটে এসেই সে হাসিমুখে খুব জোরে মা বলে ডাকতেই মা দ্রুত এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিরে এত হাসছিস কেন? উত্তরে কণা জানায়, আগামীকাল সকালে নতুন বই দেবে। বাবাকে নিয়ে স্কুলে গিয়ে নতুন বই আনতে হবে। এ কথা শুনে মা খুব খুশি হয়। বাবাকে এ খবর জানানোর জন্য কণা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তার যেন তর সইছিল না। কিন্তু বাবা তো আসবে সেই রাতে। কণা ওইদিন রাতে বাবা না-আসা পর্যন্ত জেগে অপেক্ষা করতে থাকে। রোকেয়া ঘুমিয়ে পড়ার জন্য বলার পরও সে ঘুমায় না। তার সাথে সাথে রোকেয়াও জেগে থাকে। অবশেষে রাত দশটার সময় বাবার ডাক শুনে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির গেট খুলে দেয়। বাবা ঢুকতেই সে জড়িয়ে ধরে বলে, বাবা আগামীকাল সকালে স্কুলে নতুন বই দেবে। বই নেওয়ার জন্য তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে। শুনে হামিদ মিয়া খুব খুশি হয়ে বলে অবশ্যই যাব মা। কতদিন তোর স্কুলে যাওয়া হয়নি। মেয়ের খুশির জন্য অবশ্যই সে যাবে।

রাতে কণা বাবা-মায়ের সাথে একসাথে খায়। অনেক রাত হলেও

সে ঘুমায় না। বাবার পাশে শুয়ে গল্প করতে থাকে। তার গল্প যেন ফুরাতেই চায় না, হাতে নতুন বই পাওয়া নিয়ে কৌতূহলের শেষ ছিল না কণার। নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পাওয়া ও বই বাঁধানো নিয়ে নানা কথা বলে মা-বাবাকে। বলে নতুন বই নিয়ে নানা স্বপ্ন পূরণ হওয়ার কথাও। হামিদ মিয়া মনোযোগ সহকারে মেয়ের কথা শুনতে থাকে। কণার বলা শেষ হলে বাবা শুরু করে। এভাবে বাবা-মেয়ে কথা বলতেই থাকে। তাদের কথা বলা যেন শেষ হয় না। আগামীকাল সকালে স্কুলে যেতে হবে। এজন্য রোকেয়া কপট রাগ করে তাদেরকে শুয়ে পড়ার জন্য কয়েকবার তাগিদ দেয়। কিন্তু তারা তা শোনে না। এক সময় রোকেয়া হাসতে হাসতে হামিদ মিয়াকে বলে, কিগো তোমাদের কথা কখন শেষ হবে? দেখে মনে হচ্ছে দুজনই সারাজীবনের মতো শেষ কথা বলে নিচ্ছ। আর মনে হয় কথা হবে না। উত্তরে হামিদ মিয়া জানায় রাগ কোরো না রোকেয়া। আজ কেন জানি মেয়ের সাথে সারারাত কথা বলতে এবং তার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। এ সময় কণা বাবার কথাকে সমর্থন জানিয়ে বলে, তারও ইচ্ছে করছে বাবার সাথে বসে সারারাত গল্প করতে। হামিদ মিয়া কণাকে অনেক আদর করে। কণা চোখ বন্ধ করে বাবার আদর নেয়। কখনো সে চুলে হাত বুলিয়ে বাবাকেও আদর করে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করার পর এক সময় কণা বাবাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে স্বামী ও মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রোকেয়ার মনে শান্তির আবেশ বয়ে যায়। মনে মনে ভাবে বাবা-মেয়ের ভালোবাসার এই সামাজিক বন্ধন চিরদিন যেন অটুট থাকে। এ সময় বাইরে গাছের ডালে বসে থাকা একটি প্যাঁচা কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে। তা শুনে অজানা এক আশঙ্কায় রোকেয়ার বুক কেঁপে ওঠে; স্বামী ও মেয়েকে জড়িয়ে ধরে।

খুব সকালে ঊর্ধ্বতন অফিসারের ফোন পেয়ে হামিদ মিয়ার ঘুম ভাঙে। মোবাইল ধরতেই জানানো হয় তাকে এখনই জরুরিভাবে ভিআইপি ডিউটিতে যেতে হবে। মেয়ের সাথে স্কুলে নতুন বই আনার জন্য যেতে হবে বলে ডিউটি মাফ করার জন্য হামিদ অনেক অনুনয়বিনয় করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা নাকচ করে এখনই যাওয়ার জন্য তাকে কড়া ভাষায় জানিয়ে লাইন কেটে দেন। হঠাৎ এ ধরনের

পরিস্থিতিতে হামিদ মিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কী করবে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। হতাশ হয়ে বলে কিছুতেই সে ডিউটিতে যাবে না। এতে যদি তার চাকরি যায় যাক। দুঃখে তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কথা বলার শব্দে ইতোমধ্যেই কণার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে বিছানায় চুপচাপ বসেছিল। নজর পড়তেই হামিদ মিয়া তার কাছে গেলে কণা মন খারাপ না করে বাবাকে ডিউটিতে যাওয়ার জন্য বলে। হাসিমুখে বাবাকে জানায় ডিউটি শেষ করে তুমি স্কুলে এসো। প্রয়োজনে আমি সবার শেষে বই নেব। কণার এ ধরনের কথায় হামিদ মিয়া আশ্বস্ত হয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলে, মাগো আজ তুই আমাকে বাঁচালি। তুই রাগ করলে আমি কোথায় যেতাম? তুই রেডি হয়ে স্কুলে যা আমি ডিউটি শেষ করেই স্কুলে আসছি। কণা হাসিমুখে বলে, ঠিক আছে বাবা। আর দেরি না করে হামিদ মিয়া পোশাক পরে ডিউটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। রোকেয়া ও কণা গেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেয়। এ সময় বাড়ির চালে বসে থাকা একটি কাক অনবরত কা-কা শব্দে ডেকেই যাচ্ছিল। যা শুনে রোকেয়া ও কণার মন খারাপ হয়ে যায়। তারা দুজনাই হামিদ মিয়ার চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। কেন জানি তাকে বারবার দেখতে মন চাইছিল। তাই দৃষ্টিসীমানার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তারা গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, কোনোদিন তো এমন হয় নাই। তবে আজ কেন এমন লাগছে?

বাবাকে বিদায়ের পর কণা তৈরি হয়ে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে স্কুলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এ সময় সকাল থেকে বাড়ির চালে বসে থাকা কাকটি কা-কা শব্দে আবার ডেকে ওঠে। যা শুনে রোকেয়ার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে। সে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, কোনো বিপদ হবে না তো? কণাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ম□ান হয়ে কণার যাওয়ার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বাবার জন্য মনটা প্রথমে খারাপ হলেও ডিউটি শেষে স্কুলে আসবে বলায় কণার মন থেকে কালো মেঘ দূর হয়ে যায়। তার কথা বলার ভঙ্গি সব সময় মানুষকে আকর্ষণ করে। ভাবাবেগ কখনো তাকে স্পর্শ করে না। তাইতো সব প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে নিয়ে সে নতুন বই আনার জন্য অনেক উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে উৎফুল- মনে স্কুলের পথে

যেতে থাকে।

শীতের দিন। আকাশটা আজ কেন জানি মেঘলা। সূর্য মামা মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। কুয়াশার চাদর সরিয়ে জেগে উঠেছে সকাল। ফুরফুরে হিমেল হাওয়ায় কণা স্কুল ড্রেস আর সোয়েটার পরেছে। স্কুলে পৌঁছে দেখে ছাত্রছাত্রীরা সবাই তাদের বাবাদেরকে এনেছে। পরিপূর্ণ হয়ে গেছে স্কুলের সুবিশাল মাঠ। সামনে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। চারদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। ছাত্রছাত্রীদের হইচই আর গল্পগুজবে পুরো স্কুল মুখরিত। সবাই সারি সারি চেয়ারে আসন নিয়ে বসেছে। সঙ্গে শিক্ষক ও অভিভাবকরাও। মাঠের এককোণে বড়ো মঞ্চ। ছাত্রছাত্রীদের কলরবে মুখর পুরো অনুষ্ঠান। চোখ-মুখজুড়ে আনন্দঘন উত্তেজনা। কণা পেছনের সারিতে একটা চেয়ারে নীরব হয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর শুরু হয় নতুন বই প্রদানের অনুষ্ঠান। একে একে সবাই গ্রহণ করে। কণার ডাক এলে বই নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে সবাই তাকে হাততালি বাজিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এ সময় কণা চারদিকে তাকিয়ে বাবাকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু তাকে দেখা যায় না। ভাবে, ডিউটির কারণে হয়তো আসতে দেরি হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু না বাবার কোনো পাত্তা নেই। স্টেজে বারবার নাম ঘোষণা করায় অগত্যা কণা মুখে কৃত্রিম হাসি বজায় রেখে বই আনার জন্য একাই যায়। স্টেজে সবাই নড়েচড়ে বসে কণার আসার দিকে তাকিয়ে থাকে। অসাধারণ মানের ভালো ছাত্রী বলে তার প্রতি সবার আগ্রহ বেশি। কিন্তু এ কী সে একা কেন? তার বাবাই বা কোথায়? স্টেজে পৌঁছার পর সবাই তাকে করতালির মাধ্যমে সম্ভাষণ জানায়। বাবা আসেনি কেন? তা কয়েকজন জানতে চান। কণা ধীরস্থিরভাবে জানায় ডিউটি থাকায় বাবা আসতে পারেনি। এ কথা

শুনে সবাই দুঃখপ্রকাশ করে। কণা নতুন বই গ্রহণ করায় সময় চারদিকে মুহুর্মুহু করতালি হতে থাকে। সংবাদিকরা খবরের কাগজে নিউজ কাভারের জন্য একের পর এক ছবি তুলেই যান। এ সময় কণার অনুসন্ধানী চোখ চারদিকে বারবার তাকিয়ে বাবাকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু বাবার দেখা নেই। এ সময় তার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। বই নিয়ে তার চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। কিছুক্ষণ পরপর তার চোখ বাবাকে খুঁজে ফেরে। পৃথিবীটা কতই-না বিচিত্র। আরো বিচিত্র এখানে বসবাসরত মানুষদের চিন্তাভাবনা। তাদের এ চিন্তার মধ্যে হাসিকান্না, সুখদুঃখ যেমন জড়িত তেমনি জড়িত পাওয়া-না-পাওয়ার আনন্দবেদনা। এখানে জীবনের সাথে সবাইকে যুদ্ধ করতে হয়। সে যুদ্ধে অনেকে সফল হলেও অনেকেই বিফল হয়। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। যেমনটি আজ হয়েছে কণার ক্ষেত্রে। নতুন বই পেয়েও বাবার অবর্তমানে সে খুবই মর্মাহত।

এদিকে নতুন বই পেয়ে সবাই খুব আনন্দিত। বই উৎসবে রঙিন বই রাঙিয়ে তুলেছে ছাত্রছাত্রীদের মনকে। ঝকঝকে বই হাতে পেয়েই প্রবল আগ্রহের সাথে পাতা উলটাতে থাকে তারা। এক বই রেখে আরেক বই। মুখে প্রাণখোলা পরিস্ফুটিত হাসি, সহপাঠীদের সাথে খুনশুটি। নতুন বইয়ের সোঁদা গন্ধে তারা আলোড়িত, উজ্জীবিত। উচ্ছ্বাসে মুক্ত বিহঙ্গের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল তারা। তাদের বই আনন্দ ও উল্লাস দেখে অভিভাবক আর শিক্ষকদের মুখেও ফুটে উঠেছিল তৃপ্তির হাসি। নতুন ক্লাসে উঠে তারা খালি হাতে স্কুলে গিয়ে নতুন বই নিয়ে আনন্দচিত্তে বাড়ি ফিরছে। বই প্রদানের সময় সুবিশাল মাঠজুড়ে সারি সারি চেয়ারে বসে থাকা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের হাততালিতে মুখর ছিল পুরো স্কুল। ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার রঙিন আয়োজনে মেহমানদের উপস্থিতি ছিল বাড়তি আয়োজন। হাসি আর আনন্দে মেতে উঠেছে সবাই। চতুর্থ শ্রেণির চৌকাঠ পেরিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিদ্যালয়ের আঙিনা তাদের কলরবে ছিল মুখর। অভিভাবকদের চোখেমুখেও ছিল আনন্দের ঝিলিক। কিন্তু বই পাওয়ার পরও মনে কোনো আনন্দ ছিল

না কণার মনে। সবাই একে একে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলেও সে স্কুলের গেটে বাবার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকে। চেহারাটা বিধ্বস্ত, বিষণ্ন এবং মলিন। তার এ অবস্থা দেখে বন্ধুরা-সহ অনেক অভিভাবকরা তাকে বাড়ি যাওয়ার জন্য বললে সে জানায় বাবা এলেই সে তার সাথে বাড়ি যাবে। এ সময় অনেকেই আফসোস করে মন্তব্য করেন, এ কেমন বাবা? সন্তানের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব নেই। একে একে সবাই চলে গেলেও কণা নতুন বই হাতে স্কুলের গেটে বসে বাবার আসার অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে।